BHARATI INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY
RESEARCH & DEVELOPMENT (BIJMRD)
(Open Access Peer-Reviewed International Journal)
DOI Link : https://doi.org/10.70798/Bijmrd/03020014

Available Online: www.bijmrd.com|BIJMRD Volume: 3| Issue: 02| February 2025| e-ISSN: 2584-1890

রবীন্দ্র নাটকে শ্রমজীবী মানুষ ও তাদের আন্দোলন

অনুশ্রী মাইতি দাস

Research scholar, Department of Bengali, RKDF University, Ranchi,
Email: anusripatra1990@gmail.com

প্রাক্-কথন:

এক অস্থির রাজনৈতিক পরিস্থিতির মধ্যে বেড়ে ওঠা রবীন্দ্রনাথের পারিবারিক দিক থেকে নাট্য নির্মাণ, নাট্যাভিনয় ছিল স্বাভাবিক প্রবণতা। সেই সঙ্গে সংবেদনশীল কবিমনের কারনে শ্রমজীবী মানুষদের প্রতিও তাঁর ছিল বিশেষ সহানুভূতি। যদিও তিনি সরাসরি কোন রাজনৈতিক ব্যক্তি ছিলেন না, বা সরাসরি রাজনৈতিক কথাও বলেননি, কিন্তু সমকালীন দেশ ও বিদেশের রাজনৈতিক কর্মকান্ড সম্পর্কে যথেষ্ট ওয়াকিবহাল ছিলেন। ফলে বারে বারে তাঁর নাটকে শ্রমজীবী মানুষের আন্দোলনের কথা উঠে এসেছে ভিন্ন ভিন্ন আঙ্গিকে।

মূল শব্দ: *রবীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্র নাট্য, শ্রমজীবী আন্দোলন।*

ভূমিকা:

রবীন্দ্রনাথের জন্ম ভারত ইতিহাসের সন্ধিক্ষণে, বঙ্গ সমাজের এক মাহেন্দ্রক্ষণে। রাজনৈতিক দিক থেকে সিপাহী বিদ্রোহ একটা যুগের অন্ত হলেও এই বিদ্রোহ ভারতীয় জনজীবনে যে প্রভাব ছড়িয়ে দিয়েছিল তার ফলে গোটা ভারতবর্ষই অগ্নিগর্ভ হয়ে উঠেছিল। বঙ্গদেশে ইংরেজ জাতির ঔদার্যের প্রতি বিশ্বাস নিয়ে তখন স্বজাতির স্বাধীনতার সাধনা শুরু হয়েছিল। অবশ্যম্ভাবীরূপে তার রূপ পুনরুত্থানবাদ, সংস্কারবাদ। দেবেন্দ্রনাথের ব্রাহ্ম ধর্ম প্রচার, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের স্ত্রী-শিক্ষা ও বিধবা বিবাহ আন্দোলন, নীলকরের হাঙ্গামা ও হরিশ মুখুজ্যের হিন্দু প্যাট্রিয়টে তার প্রতিবাদ, মাইকেল মধুসূদন ও দীনবন্ধু মিত্রের আবির্ভাব প্রভৃতির মধ্যে দিয়ে উদ্ভাসিত হয় সেই মাহেন্দ্রক্ষণ। রবীন্দ্রনাথের প্রথম নাট্যরচনা 'বাল্মীকি প্রতিভা' (১৮৮১)। তার আগেই ঠাকুর পরিবারে বেশ-ভূষায়, কারো গানে, চিত্রে, নাট্যে, ধর্মে স্বাদেশিকতায় যে একটি সর্বাঙ্গ সুন্দর জাতীয়তার আদর্শ গড়ে উঠেছিল, তাতে রবীন্দ্রমানস পুষ্টি লাভ করছিল। তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল লন্ডন-বাসের নানা অভিজ্ঞতা। অতএব দেশ এবং বিদেশ সম্পর্কে রবীন্দ্র মননে তখনই একটা পরিণত চিন্তা দেখা দিয়েছিল। তার মধ্যে ছিল চীনে আফিম ব্যবসায়ের বিরুদ্ধে সেখানকার জনগণের বিক্ষোভ এবং ভারতবর্ষের জনসাধারণের হৃদয়বিদারক নিদারুণ দারিদ্র্য। বহু কোটি জনসাধারণের প্রতি ইংরেজ শাসকের অবজ্ঞাপূর্ণ ঔদাসীন্য রবীন্দ্র হৃদয়কে তখনই পীড়িত করেছিল।

DISCUSSION:

'বাল্মীকি প্রতিভা'য় তখনকার স্বদেশী আন্দোলনের কোন প্রভাব অনুভূত না হলেও ওই বৎসরেই রচিত 'রুদ্রচণ্ড' নাটকে 'জগতের শ্মশানেতে প্রেত সহচরগণের প্রচণ্ড উল্লাসে মেতে ওঠা'র কথা আছে। পৃথ্বীরাজ যে লক্ষ লক্ষ গ্রাম দেশকে উচ্ছন্ন করেছে, লক্ষ লক্ষ রমণীকে বিধবা করেছে তার কথা আছে। মহম্মদ ঘোরী তস্করের মত দেশ আক্রমণ করতে এসেছে। বিদেশী আক্রমণের মুখে অমিয়া চাঁদ কবিকে যুদ্ধে যেতে বিরত করার চেষ্টা করলে সেনাপতি বলেছেন, 'আমাদের মুখে চেয়ে সমস্ত ভারত'। এ

সময়ে পথের ধারে কোন ছেলেখেলা করা উচিৎ নয়। এই বলে রণভেরী বাজিয়ে দিলেন। প্রত্যক্ষ না হলেও এই সব উক্তির মধ্যে দেশ ও দেশীয় জনগণের কথা যে তাঁর মনে ছিল তা বুঝতে অসুবিধা হয় না। 'রুদ্রচণ্ড' নাটকে প্রত্যক্ষভাবে না এলেও 'প্রকৃতির প্রতিশোধ' নাটকে, যাকে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন— 'আমার হাতের প্রথম নাটক যা গানের ছাঁচে ঢালা নয়। সেখানেই শ্রমজীবী সাধারণ মানুষের প্রথম আবির্ভাব। সেখানে সাধারণের সুখ দুঃখ সংকীর্ণ আলোচনা আছে, আর আছে অনার্য অস্পৃশ্যা বালিকার প্রতি সংস্কারগত নির্মম ঘৃণা। পরবর্তী নাটক 'রাজা ও রাণী-তে এই শ্রমজীবী মানুষের আন্দোলনের একটা বাস্তব চিত্র ফুটে উঠেছে। এখানে আছে, 'রাজশ্রী দুয়ারে বসি অনাথার বেশে কাঁদে হাহারবে।' রাজসখা দেবদত্ত দরিদ্র ক্ষুধার্ত প্রজাদের অবস্থান সম্পর্কে সত্যিকথাই বলেছেন—

"ধান্য তার বসুন্ধরা যার।
দরিদ্রের নহে বসুন্ধরা। এরা শুধু
যজ্ঞভূমে কুক্কুরের মতো লোলজিহ্বা
একপাশে পড়ে থাকে, পায় ভাগ্যক্রমে
কভু যষ্টি উচ্ছিষ্ট কখনো। বেঁচে যায়
দয়া হয় যদি, নহে তো কাঁদিয়া ফেরে
পথপ্রান্তে মরিবার তরে।"

কিন্তু তারও একটা সীমা আছে। সেই সীমা যখন অতিক্রম করে যায় তখন প্রজারাও বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। রাজপথের লোকারণ্যে শ্রমজীবী মানুষ 'কিনু নাপিত' তাই বলে, অনেক কেঁদেছি, আর কান্নার দিন নয়। 'মনসুখ চাষা বলে 'আছে যার বুকের পাটা যমরাজকে সে দেখায় ঝাটা।' 'কুঞ্জরলাল কামার' বলে, ভিক্ষে করে কিছু হবে না, আমরা লুঠ করব। 'আমরাও শাস্তর ছেড়ে অস্তর ধরব।'

এ দেশে নানা কৃষক বিদ্রোহের কথা সুবিদিত। ১৮৫৭-র মহাবিদ্রোহের সমকালে বাংলার কৃষক বিদ্রোহের বিচ্ছিন্ন ঘটনা ভারতীয় শ্রমিক শ্রেণীকে সংঘবদ্ধ হওয়ার প্রেরণা যুগিয়েছে। নীলকরদের উৎপীড়নের বিরুদ্ধে নীল চাষীদের বিদ্রোহ, খাজনা বৃদ্ধির অত্যাচারের বিরুদ্ধে পাবনার প্রজা বিদ্রোহ - এ সব ঐতিহাসিক ঘটনার কথা নিশ্চয়ই রবীন্দ্রনাথ জানতেন। পাবনার কৃষক প্রজারা কোন অবস্থাতেই জমিদারদের অন্যায় জুলুম মেনে নেয় নি।

'রাজা ও রাণী' নাটক প্রকাশিত হয় ১৯৮৮ সালে। কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠার কয়েক বৎসর পরে বাংলায় 'শ্রমজীবী সমিতি'র প্রতিষ্ঠা হয় ১৯৭০-এ। প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন কেশবচন্দ্র সেনের সহযোগী শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়। ১৮৯৪ সালে তিনিই প্রথম ভারতের শ্রমিক শ্রেণীর সংবাদপত্র 'ভারত শ্রমজীবী' প্রকাশ করেন। এই পত্রিকায় শিবনাথ শাস্ত্রী শ্রমজীবীদের সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানিয়ে এক কবিতা লেখেন। এ ছাড়া ১৮৭৭ সালে নাগপুর এমপ্রেস মিলে ধর্মঘট, ১৮৭৭ সালে ব্রাহ্ম সমাজ কর্তৃক ওয়ার্কিং মেনস্ মিশেনের প্রতিষ্ঠা, ১৯৮১ সালে ঘুসুড়ি কটন মিলে ধর্মঘট, ওয়ার্ধা হিংগনঘাট মিলের কর্মচারীদের ধর্মঘট, কুলা স্পিনিং এন্ড উইভিং মিলে শ্রমিকদের দুবার ধর্মঘট, ১৮৮২ সালে সুরাটে গুলামবাবা স্পিনিং এন্ড উইভিং মিলে শ্রমিকদের দুবার ধর্মঘট, ১৯৮৩ সালে সুরেন্দ্রনাথের কারাবাসের প্রতিবাদে বাঙালী ছাত্রদের ধর্মঘট প্রভৃতির মাধ্যমে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে শ্রমজীবী মানুষের যে আন্দোলন সংঘটিত হয়েছিল, 'রাজা ও রাণী'-র প্রজা বিক্ষোভ এবং যুদ্ধ চলাকালীন কাশ্মীরে মহাজনের দুশ্চিন্তা এবং হাটের সাধারণ মানুষের মহাজনের বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশের মধ্যে প্রত্যক্ষ না হলেও পরোক্ষভাবে তার প্রভাব পড়েছে। কাশ্মীরের হাটের লোকেরা মহাজনকে বলেছে, "এবারে তোমায় আমার একসঙ্গে মরব। তুমি রাখতে গম জমিয়ে, আর আমি মরতুম পেটের জ্বালায়। সেইটে হবে না। এবার তোমাকেও জ্বালা ধরবে। সেই শুকনো মুখখানি দেখে যেন মরতে পারি।"

'প্রায়শ্চিত্ত' (১৯০৯) নাটকেও আছে প্রজা বিক্ষোভের কথা। অজন্মার জন্য প্রজাদের অসীম দারিদ্র্য। কিন্তু তাদের কাছ থেকেও জোর করে খাজনা আদায় করতে হবে। কারণ মহারাজ প্রতাপাদিত্য দয়া জিনিসটাকে মেয়ে মানুষের লক্ষণ বলে জানেন। রাজারা কাছারিতে মেরেছে বলে প্রজারা অপমানিত এবং বিক্ষুব্ধ। তারা যখন মরিয়া হয়ে ওঠে, তখন ধনঞ্জয় নামে এক বৈরাগী, নির্ভীক, নির্লোভ অথচ সুরসিক এসে প্রজাদের বলে, 'আমার চেলা হয়েও (তোদের) মানসম্ভ্রম আছে ?' তিনি সকলের মারটাকে নিজের গায়ে তুলে নিতে গান ধরেন, 'আরো আরো প্রভু, আরো আরো / এমনি করে আমায় মারো।' তিনি সব ব্যাপারটাকেই হাল্কা করে

দেন। রবীন্দ্রনাথের বহু নাটকেই এই চরিত্র আছে। একটা গুরুগম্ভীর সমস্যা, শোষণ, শাসন ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহকে একটা সুরেলা পরিবেশে লঘু করে দিয়ে তাকে রহস্যময় করে তোলেন। আবার তিনিই প্রজাদের খাজনা দিতে নিষেধ করেন। বিক্ষুব্ধ প্রজারা বন্দীকে মুক্ত করে আনতে কারাগারে আগুন দিলে তিনি সোল্লাসে গন ধরেন, 'আগুন আমার ভাই।' আগুনকে সম্বোধন করে বলে উঠেন, 'তোমার শিকলভাঙা এমন রাঙামূর্তি দেখি নাই।' এই ধনঞ্জয় আবার হরিভক্ত। বলেন, 'হরি যেখানে নিয়ে যান সেইখানেই ভালো।'

শ্রমজীবী মানুষের আন্দোলনের দিক থেকে আরেকটা দুর্বলতা রবীন্দ্র নাটকে আছে। তা হল রাজপুত্রকে দিয়ে রাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করানো। বাজপুত্র প্রজাদুঃখে সহানুভূতিশীল, অতএব তিনি পিতৃদ্রোহী। এখানে স্মরণীয়, রবীন্দ্রনাথ যখন তাঁর 'বৌঠাকুরাণীর হাট' উপন্যাস ভেঙে এই 'প্রায়শ্চিত্ত' নাটক রচনা করেছিলেন ঠিক সেই সময়েই তিনি তাঁর বিখ্যাত উপন্যাস 'গোরা' লিখছিলেন। তখন তীব্র উত্তেজনাপূর্ণ 'সিরাজদ্দৌল্লা', 'পলাশীর প্রায়শ্চিত্ত', 'মেবার পতন', 'প্রতাপাদিত্য, প্রভৃতি নাটক রচিত হচ্ছে। ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের মধ্যে যে জাতীয়তাবাদী মনোভাবের সৃষ্টি হয়, তা বাঙালী মধ্যবিত্ত কর্মচারী, রেলপথ, ছাপাখানা প্রভৃতি শিল্পে শ্রমিক-কর্মচারীদের মধ্যেও ছড়িয়ে পড়েছিল। স্বদেশী আন্দোলন শ্রমিক আন্দোলনেও প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছিল। এই সময় বিভিন্ন ধর্মঘটের মধ্য দিয়ে কয়েকটি শ্রমিক ইউনিয়নও গড়ে উঠেছিল। এই সময়কার বার্ন কোম্পানির কেরানীদের, কলকাতার কয়েকটি ছাপাখানার কম্পোজিটার ও বিশেষ করে ইস্ট ইন্ডিয়া রেলপথের ভারতীয় শ্রমিক কর্মচারীদের ধর্মঘট অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।'

রবীন্দ্রনাথের 'অচলায়তন' (১৯১২) একটি রূপক নাটক। অচলায়তন হিন্দু সমাজের পৌরোহিত্য সংস্কারের অচলায়তন ভেঙে ফেলে শিক্ষিত স্বাধীনতাকামী মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের সমাজ মানুসের রূপ রূপকের আশ্রয়ে স্পষ্টতা লাভ করেছে। এই নাটকে শোণপাংশুরা, যারা চাষ করে, লোহা-তামা-পিতলের কাজ করে, সেই কৃষক-শ্রমিকরা অদ্ভুত। অচলায়তনের স্থবির পত্তনে চণ্ডকাদের প্রবেশের অনুমতি নেই। তাই সেখানকার প্রাচীর উঠছে ত্রিশ ফুট উঁচু করে।'প্রায়শ্চিত্ত' নাটকে ধনঞ্জয় নিষেধ করেছেন। 'অচলায়তনে'র দাদাঠাকুর একেবারে ভাঙনের ডাক দিলেন। রক্তক্ষয়ী বিপ্লবের কথা বললেন। তিনি বলেছেন অচলায়তনের প্রাচীর ভেঙে গুঁড়িয়ে দাও। তাঁর আহ্বানে শোণপাংশুরা রাজ্যসীমার প্রাচীর ভাঙতে আরম্ভ করেছে। অচলায়তনের অন্যতম আচার্য পঞ্চক অধমের গান অক্ষমের কান্না শুনে বিচলিত। অস্পৃশ্য হরিজন, কৃষক শ্রমিকদের অসহায়বোধ পঞ্চকের সমস্ত ক্রিয়াকর্মকে নিষ্ফল করে দিল। নীতিভঙ্গের দায়ে অভিযুক্ত হয়ে সে দর্ভক পাড়ায় নির্বাসিত হয়েছে। তাতে তার কোন আক্ষেপ নেই। সে জানে এ কাজটা দেবীর কাল্পনিক ভয়, উত্তর দিকের বদ্ধ জানালা মিথ্যা। গুরুর আবির্ভাবে বারংবার বন্ধ দুয়ার ভেঙে যায়। এটাই ঐতিহাসিক নিয়ম। গুরু যখন আসেন, তখন তিনি শোণপাংশ অস্পৃশ্য অন্ত্যজ হরিজনদের নিয়েই আসেন; বিদ্রোহের উন্মত্ত কোলাহল নিয়েই আসেন। পঞ্চক তার পূর্বাভাস, আচার্য তার দ্যোতক। তবে এই ভাঙনেই শেষ কথা নয়। আবার নতুন করে গড়তে হবে। ভাঙা ভিতের উপর আবার গাঁথতে লেগে যেতে হবে। ওই ভিতের উপর গতকালের যুদ্ধের রাত্রে স্থবিরকের রক্তের সঙ্গে শোণপাংশুর রক্ত মিশে গিয়েছে। অবশ্য দাদাঠাকুর বলেন, 'সেই মিলনেই শেষ করলে চলবে না, এবার আর লাল নয়, এবার একেবারে শুভ্র। নূতন সৌধের সাদা ভিতকে আকাশের আলোর মধ্যে অভ্রভেদী করে দাঁড় করাও।'

বিপ্লব সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের একটা নিজস্ব চিন্তা আছে। তাঁর 'পথ ও পাথেয়' নামক প্রবন্ধে তিনি লিখেছিলেন, ''রাষ্ট্রে বা সমাজে অসামঞ্জস্যের বোঝা অনেকদিন হইতে নিঃশব্দে পুঞ্জীভূত হইতে হইতে একদিন একটা আঘাতে হঠাৎ তাহা বিপ্লবে ভাঙিয়া পড়ে। ... গড়িয়া তুলিবার বাঁধিয়া তুলিবার একটা স্বাভাবিক প্রবৃত্তি যাহাদের মধ্যে সজীবভাবে বিদ্যমান, ভাঙনের আঘাত তাহাদের সেই জীবনধর্মকেই তাহাদের সৃজনীশক্তিকেই সচেষ্ট সচেতন করিয়া তোলে। এইরূপ সৃষ্টিকেই নূতনবলে উত্তেজিত করে বলিয়াই প্রলয়ের গৌরব। নতুবা শুধুমাত্র ভাঙন, নির্বিচার বিপ্লব কোনমতেই কল্যাণকর হইতে পারে না।' রবীন্দ্রনাথের বিপ্লবের ধারণা যাই হোক এই নাটকের প্রাচীন সংস্কার এবং স্থবিরতা থেকে বেরিয়ে পড়ার একটা উদাত্ত আহ্বান আছে। দেশে বিদেশে শ্রমজীবী মানুষের আন্দোলনেও নতুন করে গড়বে বলেই অন্যায় আর অবিচারের বিরুদ্ধে সোচ্চার প্রতিবাদ আছে। যারা ভাঙে তারা নতুন করে গড়াবে বলেই বিপ্লব করে। তার জন্য নতুন মানুষ সৃষ্টি হয় না।''

১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে 'শারদোৎসবে'র পরিবর্তিত রূপ 'ঋণশোধ' প্রকাশিত হয়। এই নাটকে রাজা বিজয়াদিত্য বলেছেন, 'আমার সিংহাসনের খাঁচার দরজা আমি চিরদিনের মতো খুলে রাখতে চাই—যাতে মাটির সঙ্গে আমার সহজ আনাগোনা চলে।' এই রাজাও রবীন্দ্রনাথের নিজেস্ব সৃষ্টি। যে স্বেচ্ছায় নিজের স্বরূপ ভেঙে প্রজামঙ্গলের জন্য বেরিয়ে আসতে চায়। রাজকবি শেখর বসে, 'রাজাকে সাজতে হয় সন্ন্যাসী, রাজা কে কী জিনিসসেই বোঝাবার জন্য। যে মানুষ সব দেশেই দেশকে খুঁজতে চায়, তাকে

পরদেশী সাজতে হয়। এখানে উল্লেখযোগ্য, এই নাটক লেখার আগেই রাশিয়ায় সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সাফল্য লাভ করেছে। অবশ্য আমাদের দেশে ব্রিটিশ সরকার তখন এই বিপ্লবের বিকৃত সংবাদ পরিবেশন করে জনগণকে বিভ্রান্ত করছিল। | কিন্তু রবীন্দ্রনাথের বুঝতে অসুবিধা হয় নি যে সেখানে প্রজাপুঞ্জ বা শ্রমজীবী মানুষ রাজার সিংহাসনকে মাটির ধুলায় মিশিয়ে দিয়ে শ্রমিক কৃষক রাজ প্রতিষ্ঠিত করেছে। অতএব রাজা যদি স্বেচ্ছায় নিজের সিংহাসন ছেড়ে মাটির সঙ্গে গভীর যোগাযোগ রাখে তাহলে আর এই বিপত্তি ঘটতে পারে না। 'ঋণশোধ'-এ সেই ধারণাই প্রকাশ ঘটেছে।

'মুক্তধারা' (১৯২২) নাটকেও 'প্রায়শ্চিত্ত' নাটকের মত অত্যাচারী রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রজা বা গণবিদ্রোহের কথা আছে এবং প্রজা-বিদ্রোহের নায়ক সেই ধনঞ্জয়কেই করা হয়েছে। সেখানে ধনঞ্জয় বলছে, 'রাজাসনে বসলেই রাজত্ব হয় না। ধনঞ্জয় দুর্ভিক্ষপীড়িত প্রজাদের বলেছেন, 'রাজত্ব একলা যদি রাজারই হয়, প্রজার না হয়, তাহলে সেই খোঁড়া রাজত্বের লাফানি দেখে তোরা চমকে উঠতে পারিস, কিন্তু দেবতার চোখে জল আসে। ওরে রাজার খাতিরেই রাজত্ব দাবি করতে হবে।' মন্ত্রীও রাজাকে পরামর্শ দিয়ে বলেছেন, 'রাজকার্যে ছোটদের অবজ্ঞা করতে নেই। মনে রাখবেন যখন অসহ্য হয় তখন দুঃখের জোরে ছোটরা বড়দের ছাড়িয়ে বড় হয়ে ওঠে।' তবে এই নাটকে এই বক্তব্যের ব্যাপ্তি 'প্রায়শ্চিত্ত' নাটকের চেয়ে বেশি। এখানে পুঁজিবাদী সাম্রাজ্যবাদী অত্যাচারী শক্তির অত্যাচারের কথাই বলা হয়েছে। উত্তরকূটে যখন মজুর পাওয়া চাচ্ছিল না, তখন রাজার আদেশে চণ্ডপত্তনের প্রত্যেক ঘর থেকে আঠারো বছরের উপরের বয়সের ছেলেকে আনিয়ে নিয়েছে। এত যুদ্ধের সময় সাম্রাজ্যবাদী শক্তির আচরণ। দুর্ভিক্ষ, খাজনা আদায়ের কথা অনেক নাটকেই আছে। এই নাটকেও আছে। তাছাড়া, রাজা রণজিৎ যখন বলেন, 'বিদেশী প্রজাদের চাপে রাখাই রাজনীতি', পরকে পাওয়া যায় ভয় জাগিয়ে রেখে, শিবতরাইয়ের পশম যাতে বিদেশের হাটে বেরিয়ে না যায় এই জন্যে পিতামহদের আমল থেকে নন্দিসংকটের পথ আটক করা আছে, চণ্ডপত্তনের বিদ্রোহ প্রজার সর্বনাশ করেই। দমন করা হয়েছে, তখন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের ঔপনিবেশিক শাসন এবং অত্যাচারের কথাই মনে আসে। চা-বাগানের শ্রমিকদের ওপর মালিকের অত্যাচার দাস মালিকদের অত্যাচারকেও হার মানাত। ১৯২১ সালের ২০শে মে'র ক্যালকাটা সমাচার' লিখেছিল, 'এদের দুর্ভাগ্যের কথা লোকে দীর্ঘকাল ধরে শুনে আসছে। সামান্যতম ত্রুটির জন্য মালিকরা তাদের চাবুক বা লাথি মারে।' বিচারব্যবস্থা তো প্রহসন। কিন্তু সহ্যের সীমা যখন চরমে পৌঁছে তখন অসন্তোষের আগুন জ্বলে ওঠে। ইন্ডিয়ান ডেইলি নিউজ লিখেছিল, 'আজকাল লোকে আর নীরবে অত্যাচার ও অপমান সহ্য করতে রাজি নয়। দমননীতি দ্বারা তাদের অসন্তোষ দূর করা যাবে না। চা বাগিচায় বিরাট ধর্মঘট দেখা দেয়। প্রথম মহাযুদ্ধের পরবর্তীকালে ব্যাপকভাবে অসন্তোষ দেখা দেয়। বাগিচাত্যাগী ধর্মঘটী শ্রমিকদের উপর অত্যাচারের প্রতিবাদে রেলপথ, ট্রাম, কয়লা খনি, চটকল প্রভৃতিতে সাধারণ ধর্মঘট পালিত হয়। অসম বেঙ্গল রেলপথ ও স্টিমার কোম্পানীর শ্রমিকরা দীর্ঘমেয়াদী ধর্মঘট আরম্ভ করে। সাম্রাজ্যবাদী শাসকরা এই ধর্মঘটে বলশেভিকবাদের জুজু দেখতে পেলেন। দেশব্যাপী এই বিরাট বিক্ষোভের কথা রবীন্দ্রনাথের অজানা থাকার কথা নয়। 'মুক্তধারা' নাটকে এই অসন্তোষ ও বিক্ষোভের প্রকাশ অনুমিত হয়। অসন্তোষের আগুনে বন্দীশালা ভস্মীভূত হয়েছে। শিবতরাইয়ের লোকদের নিত্য দুর্ভিক্ষের হাত থেকে বাঁচাবার জন্য অভিজিৎ নন্দিসংকটের পথ খুলে দিয়েছিল এবং শেষ পর্যন্ত শিবতরাইয়ের প্রজাদের অনাহারে মারবার চক্রান্ত মুক্তধারার বন্ধ আগলও নিজের প্রাণের বিনিময়ে মুক্ত করে দিয়েছে। এই নাটকে পুঁজিবাদী ঔপনিবেশিক রাজার পরাজয় হয়েছে, প্রজাদের জয়লাভ হয়েছে। এখানেও বিদ্রোহের নেতা ধনঞ্জয়। জনসাধারণের প্রকৃতি ও পরিণতি একই প্রকারের। প্রজারা অত্যাচারী চণ্ডপালের মায়ের প্রতিশোধ নিতে চাইলে ধনঞ্জয় বলে, 'ঢেউকে বাড়ি মারলে ঢেউ থামে না, হালটাকে স্থির করে রাখলে ঢেউ জয় করা যায়।' এই ধনঞ্জয় জনগণকে এক আধ্যাত্মিক রহস্যলোকের কথা বলে ভুলিয়ে রাখে। এই নাটকে একটা নতুন জিনিস আছে। সেটা হচ্ছে উত্তরকূটের রাজার ভেদবুদ্ধি। শিবতরাই-এর লোকদের বিরুদ্ধে, উত্তরকূটের মানুষদের মধ্যে প্রাদেশিক ভেদবুদ্ধি জাগিয়ে রাজা দু-দলকেই প্রকারান্তরে দুর্বল করে সুকৌশলে শাসন চালাতে চান। শিক্ষার নামে পাঠশালা থেকেই শিশুদের সহজ বুদ্ধিকে গুরু মশায়ের সাহায্যে বিকৃত করে দেওয়া হচ্ছে।

মার্কসবাদ অনুযায়ী নানা কারণে পুঁজিতন্ত্রেকে কিছুদিন পর পর সংকটের মধ্যে পড়তে হয়। পুঁজিতন্ত্রে এই সংকট অপরিহার্য। পুঁজিতন্ত্রের কাঠামোর মধ্যে পুঁজিতন্ত্রের মুক্তি নেই। প্রথম সাম্রাজ্যবাদী মহাযুদ্ধের ফলেও সংকটের অবসান হয় নি। যুদ্ধের পরে পুঁজিতন্ত্রী দেশগুলিতে সকল রকামের উৎপাদনের বৃদ্ধি হলেও কায়েক বছরের মধ্যেই পুঁজিতন্ত্র আবার এক সর্বগ্রাসী সংকটের মধ্যে নিমজ্জিত হয়। 'রক্তকরবী'র যক্ষপুরীর রাজাও এক গভীর সংকটে নিমজ্জিত। সেই নিজেই স্বীকার করে, 'আমি প্রকাণ্ড মরুভূমি। শক্তির ভার নিজের অগোচরে কেমন করে নিজেকে পিষে ফেলে সেই পাহাড়টাকে দেখে তাই বুঝেছিলুম।' রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'এই নাটকটি সত্যমূলক। এর ডাক নাম যক্ষপুরী। এ নাটক একেবারেই পৌরাণিক কালের নয়, একে রূপকও বলা

যায় না। এটা সত্যই আধুনিক বুর্জোয়া শোষণের এক নাটকীয় চিত্র। মার্কস-এঙ্গেলস কমিউনিস্ট পার্টির ইশতেহারে বলেছেন, "বুর্জোয়া শ্রেণী যেখানেই প্রাধান্য পেয়েছে সেখানেই সমস্ত সমাজতান্ত্রিক, গোষ্ঠীতান্ত্রিক এবং রাখালিয়া সম্পর্ক শেষ করে দিয়েছে। বিবিধ সামন্ততান্ত্রিক বাঁধনে মানুষ বাঁধা ছিল 'স্বতঃস্ফূর্ত ঊর্ধ্বতনদের কাছে, সেগুলোকে এরা ছিঁড়ে ফেলেছে নির্মমভাবে, আর মানুষের সঙ্গে মানুষের দৃষ্টিগোচর স্বার্থের বন্ধন, নির্বিকারে 'নগদ টাকার বাঁধন ছাড়া আর কিছুই এরা বাকি রাখে নি। আত্মসর্বস্ব হিসাব-নিকাশের বরফজলে এরা ডুবিয়ে দিয়েছে ধর্মীয় উদ্দীপনার অতি দিবা ভাবোচ্ছ্বাস, শৌর্যবৃত্তির উৎসাহ আর কূপমণ্ডুক ভাবালুতা। লোকের ব্যাক্তিমূল্যকে এরা বিনিময়- মূল্যে পরিণত করেছে, আর অগনিত অনস্বীকার্য সনদবদ্ধ স্বাধীনতার স্থানে এরা খাড়া করেছে ওই একটিমাত্র স্বাধীনতা – অবাধ বাণিজ্য, যাতে বিবেকের স্থান নেই। এককথায়, ধর্মীয় আর রাজনৈতিক বিভ্রমে ঢাকা শোষণের বদলে এরা এনেছে নগ্ন, নির্লজ্জ, সাক্ষাৎ পাশবিক শোষণ।" "যে সব বৃত্তিকে লোকে এতদিন সম্মান করে এসেছে, সশ্রদ্ধ বিস্ময়ের চোখে দেখেছে, বুর্জোয়া শ্রেণী সেই সবগুলিরই মাহাত্ম্য ঘুচিয়ে দিয়েছে। চিকিৎসক, ব্যবহারজীবী, যাজক, কবি, বিজ্ঞানী – সকলকেই এরা নিজেদের - মজুরি - ভোগী শ্রমজীবীতে পরিণত করেছে।" যপুরীতে আমরা এই বক্তব্যেরই চিত্ররূপ দেখতে পাই। এখানে স্বর্ণলালসায় উন্মত্ত রাজা গ্রামের কৃষি থেকে মানুষগুলোকে টেনে নিয়ে এসে খনিতে নামিয়ে দিয়েছে। এরা নিঃস্ব, রক্তের বিনিময়ে এরা রাজার ঐশ্বর্য ক্ষুধা মিটিয়ে নিঃশেষ হয়ে গিয়েছে। জমিজমা বৃদ্ধি হারা মানুষ দিন মজুরিতে খনির কাজ করতে এসেছে। ঘর বাড়ি হারিয়ে বস্তিতে উঠেছে। এখানে নির্মম শোষণ ও শাসনের যাঁতাকলে এদের প্রাণরস নিংড়ে নিয়ে ছোবড়াতে পরিণত করে সর্বনাশের আস্তাকুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলে দিচ্ছে। এখানে তারা নামগোত্রহীন অসহায় বিকৃত বিভ্রান্ত কতগুলো সংখ্যা মাত্র। এখানকার পুরোহিত অধাপক সকলেই মজুরিভোগী শ্রমজীবী। এই নাটকের পালোয়ান ঠিকই বলে, 'সমস্ত পৃথিবীকে নিঃশক্তি করতে পারলে তবে ওরা নিশ্চিত্ত হয়। ...এরা কোথাকার দানব, জাদু জানে। শুধু জোর নয়, একেবারে ভরসা পর্যন্ত শুষে নেয়।'

কিন্তু এই দানবিকতা ইতিহাসের শেষ কথা নয়। মুনাফার স্বার্থে বুর্জোয়া শ্রেণী যে শ্রমিক শ্রেণী সৃষ্টি করেছে একদিন সেই শ্রমিক শ্রেণী সৃষ্টি করেছে একদিন সেই শ্রমিক শ্রেণীর হাতেই তাদের ধ্বংস হবে। এই নাটকে শ্রমিক শ্রেণীর বৈপ্লবিক শক্তির বিবেক হিসেবে সৃষ্টি হয়েছে নন্দিনীকে। রবীন্দ্রনাথ বলেছে, নন্দিনী এ নাটকে জেলেদের জালে অখাদ্য জগতের জলচর। জাল ছিঁড়ে বের হয়ে যায়। নন্দিনী রাজাকে বলেছেন, 'এইবার সময় হল। এবার আমার সমস্ত শক্তি দিয়ে তোমার সঙ্গে আমার লড়াই। অস্ত্র মৃত্যু নেই, আমার অস্ত্র মৃত্যু।' শৃঙ্খলা ছাড়া সর্বহারার হারাবার মত কিছু নেই। তাদের জয় করবার জন্য আছে সারা জগৎ। সেখানে তাদের একমাত্র উপায় সংহতি। নন্দিনী সেই সংহতির প্রতীক। ভাঙনের প্রতীক। নন্দিনীর আহবানে সব অসহায় শোষিত মানুষই এসে ভিড় করেছে। এই নাটকে শেষ পর্যন্ত রাজাও তার জালের মধ্য থেকে বাইরে বেরিয়ে এসেছে। শ্রমিক ফাগুলালদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে বন্দীশালা ভাঙতে বেরিয়েছে। এখানে কবি কল্পনার আধিক্য আছে। কমিউনিস্ট পার্টির ইশতেহারে আছে, 'শেষ পর্যন্ত, শ্রেণী সংগ্রাম যখন চূড়ান্ত মুহূর্তের কাছে এসে পড়ে, তখন শাসক শ্রেণীর ভিতরে, বস্তুতপক্ষে পুরাণ সমাজের গোটা পরিধি জুড়ে সক্রিয় ভাঙনের প্রক্রিয়াটা এমন উগ্র দগদগে হয়ে ওঠে, যাতে শাসক শ্রেণীর একটা ছোট অংশ ছিঁড়ে বেরিয়ে এসে হাত মেলায় বিপ্লবী শ্রেণীর সঙ্গে। যে শ্রেণীর হাতেই ভবিষ্যৎ। সুতরাং আগেকার এক যুগে যেন অভিজাতদের একটা অংশ বুর্জোয়া শ্রেণীর পক্ষে চলে গিয়েছিল, ঠিক তেমনি এখন শ্রমিক শ্রেণীর সঙ্গে যোগ দেয় বুর্জোয়াদের একটা ভাগ, বিশেষ করে বুর্জোয়া ভাবাদর্শ বিদদের একাংশ, যারা ইতিহাসের সমগ্র গতিকে তত্ত্বের দিক থেকে বুঝতে পারার স্তরে নিজেদের উন্নীত করেছে।' এই নাটকে রাজা নিজে বেরিয়ে এসেছে নিজের বিরুদ্ধে লড়াই করতে। যে লড়াই শুরু করেছে বিপ্লবী শ্রমিক শ্রেণী। নন্দিনীকে রাজা আহ্বান জানিয়েছে তার হাতে হাত রেখে তার বিরুদ্ধে লড়াই করতে। এটা বাস্তবোচিত নয়। শোষকের হাতে তাল মিলিয়ে শোষিতের লড়াই কখনো সফল হতে পারে না। শোষক নিজেকে টিকিয়ে রাখবার জন্য শোষিতকে বিভ্রান্ত করবেই। অস্তিত্ব রক্ষার জন্য সকলেই সক্রিয়। কবি কল্পনার এই আতিশয্য বাদ দিলে আধুনিক বুর্জোয়া সমাজের এবং শ্রমজীবী মানুষের দুরবস্থার একটা সত্য চিত্র এই নাটকে পাওয়া যায়। পাওয়া যায় শ্রমজীবী মানুষের অজেয় সংগ্রামের কথা। এগিয়ে চলার কথা। শ্রমিক কারিগরদের বন্দীশালা ভেঙে ফেলার কথা। এটাই 'রক্তকরবী'র বাণী। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, তিনি রাজনীতিকের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে এই নাটক লেখেন নি, লিখেছেন একজন কবির দৃষ্টিভঙ্গি থেকে, সম্ভবত একজন গীতিকবির দৃষ্টিতে মানব ইতিহাসের একটি নাটক।

বহুদিন পরে রবীন্দ্রনাথ 'প্রায়শ্চিত্ত' নাটকটি কিছু পরিবর্তন করে পরিত্রাণ' নামে প্রকাশ করেন (১৯২৯)। 'বউঠাকুরাণীর হাট' উপন্যাসের এটি দ্বিতীয় নাট্যরূপ। এখানেও ধনঞ্জয় চরিত্র আছে। রাজশক্তির বিরুদ্ধে অসহায় প্রজাদের পক্ষ নিয়ে রাজকুমার

উদয়াদিত্য এবং তার স্ত্রী সুরমা বিপদকে অগ্রাহ্য করে সত্য ও ন্যায়ের নির্দেশ পালন করে চলেছেন, বারবার কারাবরণ ও মৃত্যু পর্যন্ত স্বীকার করে নিয়েছেন। প্রাচীন ঐতিহাসিক কাহিনি অবলম্বনে লেখা হলেও এই নাটকে আধুনিক কালের শ্রমজীবী মানুষের অসন্তোষ, বিক্ষোভ ও রাজনৈতিক অবস্থার কথা আছে। মাধবপুরের প্রজারা বিদ্রোহী হয়েছে। তারা বলছে, মরতে হয় মরব, কিন্তু আমাদের আর দুঃখ সহ্য হয় না। তারা কারাগারে আগুন লাগিয়ে বন্দী যুবরাজকে মুক্ত করে এনেছে।

বাংলায় দুইয়ের দশক শ্রমিক জাগরণের দশক বলে চিহ্নিত করা যায়। ১৯২৭ সালে বিখ্যাত সফল খড়্গপুরের বেঙ্গল নাগপুর রেল শ্রমিকদের ধর্মঘট, লিলুয়ার রেলশ্রমিক ধর্মঘট, কলকাতার অ্যালবার্ট হলে খড়্গপুরের ধর্মঘটী শ্রমিকদের সমর্থনে বুদ্ধিজীবীদের সভা, কলকাতার ধাঙ্গড়দের ধর্মঘট প্রভৃতি শ্রমজীবী মানুষের আন্দোলনে প্রসিদ্ধ ঘটনা। ১৯২৮ সালে পার্ক সার্কাসে কংগ্রেস অধিবেশনে বিভিন্ন দাবি নিয়ে প্রায় পঞ্চাশ হাজার শ্রমিকের শোভাযাত্রা উপস্থিতি আরো একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। ঐ শোভাযাত্রার কিছু কিছু ফেস্টুনে লেখা ছিল 'দুনিয়ার শ্রমিক এক হও', 'শৃঙ্খল ছাড়া তোমার হারাবার কিছুই নেই, 'স্বাধীন প্রজাতান্ত্রিক ভারত দীর্ঘজীবী হোক'। একই বিষয়বস্তু নিয়ে বারবার পরিবর্তিত রবীন্দ্রনাটকে এই শ্রমিক জাগরণের অগ্রগতির সংবাদ আছে।

একই বৎসরে রবীন্দ্রনাথ 'রাজা ও রাণী' নাটককে নতুন করে লিখে 'তপতী' নামে প্রকাশ করলেন। এই নাটকেও প্রজাদের উপর উৎপীড়নের কথা আছে, রাজার অপশাসনের কথা আছে। তীর্থদ্বারে কর বসানো হয়েছে। কর না দিলে মেয়েদের হাত থেকে কঙ্কন কেড়ে নিয়ে কর আদায় হচ্ছে। কর সংগ্রহের জন্য রাজার অনুচর নিযুক্ত, সুন্দরী মেয়েদের বিপদ ঘটছে প্রতিদিন। রাজসখা দেবদত্ত সত্যিকথাই বলেছেন, 'রাজারা যখন অন্যায় করেন তখন তার সমর্থনের জন্য অতি ভীষণ হয়ে ওঠেন।' বহু কণ্ঠ ছেদন করে রাজা রাজ্যের কণ্ঠরোধ করে। রাজমহিষী সুমিত্রা বলেছেন, 'দ্বার ভেঙে ফেলুক না। বিচার ভয়ে ভয়ে চায় বলেই তো ওরা বিচার পায় না। রাজা যত বাড়ো জোরের সঙ্গে ওদের কাছে কর দাবি করে, তত বড়ো জোরের সঙ্গেই ওদের বিচার চাবার অধিকার।'- এই যে অধিকার বোধ, প্রতিবাদের সুর, এ সেই সময়কারের শ্রমজীবী মানুষেরই প্রতিবাদ। এই নাটকে কোন নেতা ছাড়াই জনগণ নির্ভীকভাবে এগিয়ে এসেছে তাদের অভাব অভিযোগের প্রতিকারের দাবিতে। কু-শাসনের বিরুদ্ধে ক্ষুব্ধ জনসমুদ্র এসে প্রলয় গর্জনে ভেঙে পড়ছে রাজপুরদ্বারে। রত্নেশ্বর নামে অত্যাচারিতদের একজন রাণীকে স্পষ্টই বলল, 'আমরা অত্যন্ত ভীরু মহারাণী, কিন্তু অত্যন্ত দুঃখে আমাদেরো ভয় ভেঙে যায়। সেই জন্যই এমন করে চলে আসতে পেরেছি। জানি বিপদ সাংঘাতিক, কিন্তু বিপদের চেয়ে যেখানে গ্লানি দুঃসহ সেখানে আমাদের মতো দুর্বলও বিপদকে গ্রাহ্য করে না। না খেয়ে মরার দুঃখ কম নয়; কিন্তু এমন অবস্থা আছে যখন বেঁচে থাকার মতো দুঃখ আর নেই।'

নিউটনের তৃতীয় গতিসূত্র অনুসারে প্রত্যেক ক্রিয়ারই একটা সমান এবং বিরুদ্ধ প্রতিক্রিয়া থাকে। রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন নাটকে মূঢ়, ম্লান, মুক জনগণ রাজার অত্যাচারে বিদ্রোহী ভাবাপন্ন হয়ে উঠেছে। কখনো তারা হরিভক্ত বৈরাগী ধনঞ্জয়ের সাহায্যে কখনো বা নিজেরা অবস্থার চাপে মরিয়া হয়ে প্রতিবাদে রাস্তায় বা রাজপুরদ্বারে এসেছে। সেখানে রাজমাতা, রাজপুত্র বা মান্য কেউ তাদের সহায় হয়েছে। তাদের মধ্য দিয়েই প্রজাদের বিক্ষোভ ভাষারূপ লাভ করেছে। বৈরাগী ধনঞ্জয় মূল সমস্যাটা ধরেও তাকে এক আধ্যাত্মিক রহস্যময়তায় আবৃত করে দিয়েছে। কিন্তু জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে যে শ্রমজীবী মানুষ সংগঠিত আকারে কোথায়ও সফল বিপ্লব করেছে, কোথাও আন্দোলন করেছে, তাদের সেই শ্রেণী সচেতনতা বা সংগঠিত রূপের কোন প্রকাশ রবীন্দ্রনাটকে পাওয়া যায় নি। শ্রেণী হিসেবে তাদের সেই চেতনার পরিচয় এসেছে 'কালের যাত্রা' নাটকে (১৯৩২)। 'রথের রশি' এবং 'কবির দীক্ষা' একত্রে 'কালের যাত্রা'। বহু পূর্বে লেখা 'রথযাত্রাই পরে গদ্যছন্দে পরিণত হল 'রথের রশি'তে। কালের রথ চালাবার বাধা দূর করবার মহামন্ত্র রচনার আহ্বান জানিয়ে 'পথের দাবী'র রচয়িতা শরৎচন্দ্রের প্রতি উৎসর্গ পত্রে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, 'রথযাত্রার উৎসবে নরনারী সবাই হঠাৎ দেখতে পেলে মহাকাশের রথ অচল। মানব সমাজের সকলের চেয়ে বড়ো দুর্গতি, কালের এই গতিহীনতা। মানুষে মানুষে যে সম্বন্ধবন্ধন দেশে দেশে যুগে যুগে প্রসারিত, সেই বন্ধনই এই রথ টানার রশি। সেই বন্ধনে অনেক গ্রন্থি পড়ে গিয়ে মানব সম্বন্ধ অসত্য ও অসমান হয়ে গেছে, তাই চলছে না রথ। এই সম্বন্ধের অসত্য এতকাল যাদের বিশেষভাবে পীড়িত করেছে, অবমানিত করেছে, মনুষ্যত্বের শ্রেষ্ঠ অধিকার থেকে বঞ্চিত করেছে, আজ মহাকাল তাদেরই আহ্বান করেছেন তাঁর রথের বাহনরূপে; তাদের অসন্মান ঘুচলে তবেই সম্বন্ধের অসাম্য দূর হয়ে রথ সম্মুখের দিকে চলবে।' এই বক্তব্য অত্যন্ত স্পষ্ট।

'মহাকালের রথ' মানব সভ্যতার ইতিহাস। এই ইতিহাসে যারা চিরকাল দাঁড় টেনে, চাষ চাষ, ফসল ফলিয়ে, তাঁত বুনে, কারখানা চালিয়ে এসেছে তারাই মূল শক্তি। এই শক্তিকে এতকাল বিত্ত, অস্ত্র এবং শাস্ত্রের জোরে দাবিয়ে রাখা হয়েছে। বর্তমান পুঁজিবাদী

সমাজের মূল চালিকা শক্তি ধনিক গোষ্ঠী। তারাই সৈন্য এবং পুরুতের সাহায্যে সমাজের অধিকাংশ মানুষকে শোষিত এবং বর্ণিত করে এতকাল শাসনযন্ত্র চালিয়ে এসেছে। কিন্তু তাদের যুগ অবগত। এ কালের রাজত্বে রাজা থাকেন সামনে, পিছনে থাকে বেনে। যাকে বলে অর্ধ-বেনে-রাজেশ্বর মূর্তি।' সেই পুঁজিবাদীদের নাভিশ্বাস উঠেছে। সার্থক উত্তরণ সমাজতন্ত্রের পথে। রাশিয়া থেকে ঘুরে এসে রবীন্দ্রনাথের এ ধারণা হওয়া খুবই স্বাভাবিক। 'কালের যাত্রা'র ডাক পড়েছে সেই ভাবী যুগের কর্ণধারদের। তারা শূদ্র শ্রমজীবী মানুষ। ওদের দলপতি বলে—

"এতদিন আমরা পড়তেম রথের চাকার তলায়,
দলে গিয়ে ধুলোয় যেতুম চ্যাপটা হয়ে।
....
আমরাই তো জোগাই অন্ন, তাই তোমরা বাঁচ--
আমরাই বুনি বস্ত্র, তাতেই তোমাদের লজ্জারক্ষা।"

রবীন্দ্রনাথ এই নাটকে শোষিত শ্রমজীবী মানুষকে সম্পূর্ণ সচেতন, সক্রিয় এবং বলিষ্ঠ নেতৃত্বের ভূমিকায় দাঁড় করিয়েছেন। সমাজ পরিবর্তনের অবশ্যম্ভাবী গতিকে তিনি স্বীকার করে নিয়েছেন। তাই মন্ত্রী বলে—

"ওরাই যে আজ পেয়েছে কালের প্রসাদ।
এবার থেকে মন রাখতে হবে ওদের সঙ্গে সমান হয়ে"

কবি এই অনিবার্য সত্যকে স্বীকার করে নিয়ে বললেন-
"যুগাবসানে লাগেই তো আগুন।
যা ছাই হবার তাই ছাই হয়
যা টিকে যায় তাই নিয়ে সৃষ্টি হয় নবযুগের।"

CONCLUSION:

আধুনিক যুগের যারা প্রধান নায়ক, অগ্রমামী সৈনিক, সেই শ্রমজীবী মানুষের হাতে রবীন্দ্রনাথ অবশেষে মহাকালের রথের রশি তুলে দিয়েছেন। তার প্রকাশ কাব্যিক হলেও বক্তব্য দৃঢ়, কালোপযোগী। দেশে বিদেশে যে শ্রমজীবী মানুষের জাগরণ এবং উত্থান ঘটেছে রবীন্দ্রনাথ 'কালের যাত্রা'র সেই উত্থানেও স্বাগত জানিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ বারবার বলেছেন তিনি রাজনীতিক নন। তিনি কবি। সে জন্য কোন রাজনৈতিক জটিলতার মধ্যে তিনি জড়িয়ে পড়তে চান নি। আবার কবি যে যুগে বাস করেন তিনি যদি যথার্থই মহাকবি বা সাহিত্যিক হতে চান তাহলে সে যুগকে উপেক্ষা করে তিনি কোন মহৎ সৃষ্টি করতে পারেন না। 'ঘরে বাইরে' উপন্যাস প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ একথা স্বীকার করেছেন। জীবনের একেবারে শেষ প্রান্তে দাঁড়িয়ে আত্ম পরিচয়ে তিনি ঘোষণা করলেন, 'আমি পৃথিবীর কবি, যেথা তার যত উঠে ধ্বনি / আমার বাঁশির সুরে সাড়া তার জাগিবে তখনি।' স্বভাবতই তিনি তার সময়কালে যে সব বড় বড় ঘটনা ঘটেছে বিশেষ করে যে সব ঘটনায় মানবচিত্তকে সবচেয়ে বেশি বিচলিত করেছে তিনি তার প্রতি উপেক্ষা করতে পারেন নি। স্বাভাবিক এক প্রচণ্ড মানবিকতাবোধের তাড়নায় তিনি উৎপীড়িতের পাশে গিয়ে দাঁড়িয়েছেন। প্রসঙ্গত রম্যা রুলার একটা কথা স্মরণীয়। তিনি লিখেছেন, 'যখনি কোন নিমজ্জমান ব্যক্তির আর্তনাদ আমার কানে আসে তখনই আমি বিপন্ন মানুষের সাহায্যে ছুটে যাই। বিপন্নকে বাঁচাবার জন্য হত্যাকারীর সঙ্গে সংগ্রামে আমি প্রস্তুত হই।' রবীন্দ্রনাথও তাঁর 'পথের শেষে' কবিতায় বলেছেন, 'আমি চলিলাম, / রেখে যাই আমার প্রণাম / তাঁদের উদ্দেশ্যে যাঁরা জীবনের আলো / ফেলেছেন পথে যাহা বারে বারে সংশয় ঘুচালো।' সমাজে সবচেয়ে অগ্রগামী মানুষ হল সচেতন শ্রমিক এবং শ্রমজীবী মানুষ। অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়েই তারা মানবমুক্তির দিকে, শোষণহীণ সমাজ গঠনের দিকে এগিয়ে যায়। ব্যাপক অর্থে এই বোধের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের কোন বিরূপতা নেই, বরং সহমর্মিতা আছে। সে জন্য 'রুদ্রচণ্ড' নাটক থেকে 'তাসের দেশ' নাটক পর্যন্ত আমরা বিভিন্ন নাটকে দেখি রবীন্দ্রনাথ রাজনীতিকের মত শ্রমজীবী মানুষের আন্দোলনের পাশে এসে না দাঁড়ালেও যেখানেই সভ্যতার সংকট, অত্যাচারের নিষ্ঠুরতা, মধ্যযুগীয় কুসংস্কারের জড়তা (যেমন, 'বিসর্জন, 'মালিনী' নাটকে, সেখানে তিনি যে মানবিকতার

আবেদন নিয়ে ঘটনা এবং চরিত্র সৃষ্টি করেছেন সেগুলো শ্রমজীবী মানুষের আন্দোলনের পক্ষেই যায়। রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন নাটক পরিক্রমা করে আমরা দেখেছি তিনি তাঁর নাটকে যে জনগণকে উপস্থিত করেছেন তারা প্রজা সাধারণ। চাষী, কামার, নাপিত, শ্রমিক প্রভৃতি। তারা অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানায়, বিদ্রোহ করে, বন্দিশালায় আগুন জ্বালায়। শেষ পর্যন্ত তারা শ্রেণী হিসেবে জেগে উঠে মহাকালের রথের রাশিতে টান মেরে। এতকাল যারা বিত্ত, অস্ত্র ও শাস্ত্রের জোরে 'বড়ো'র দাবি করত, তারা পরাজিত হয়। এই শ্রমজীবী মনুষই সকলের অন্নবস্ত্র যোগান দেয়। তাদের জোরেই ঘোরে সভ্যতার চাকা, নইলে সব অচল। এখন তারা নিজেদের ওজন বুঝে সচেতন হয়েছে। তাই জগতের রাষ্ট্র পরিচালনার ভারও তাদের হাতে নিতে হবে। এই সচেতনতা এবং সঙ্ঘবদ্ধ অগ্রগতির আশা ও ভাষা দিয়ে শ্রমজীবী মানুষের আন্দোলনকে তিনি পুষ্ট করেছেন। রবীন্দ্রনাথই প্রথম বাংলা নাটকে শ্রমজীবী মানুষের কালের যাত্রা ঘোষিত করলেন।

গ্রন্থপঞ্জি

১. মজুমদার উজ্জ্বলকুমার (সম্পাদনা), রাতের তারা দিনের রবি, আনন্দ পাবলিশার্স, ১ম সংস্করণ, ১৩৯৫, কলকাতা
২. বন্দ্যোপাধ্যায় হিরন্ময়, উপনিষদ ও রবীন্দ্রনাথ, নবপত্র প্রকাশন, ১ম প্রকাশ, ১৯৮৩, কলকাতা।
৩. দাশগুপ্ত শশিভূষণ, উপনিষদের পটভূমিকায় রবীন্দ্রমানস, এ. মুখার্জী এন্ড কোং প্রা. লি., ২য় সংস্করণ, ১৩৮১, কলকাতা
৪. চক্রবর্তী অজিতকুমার, কাব্য পরিক্রমা, বিশ্বভারতী, বিশ্বভারতী সংস্করণ, ১৯০৪, কলকাতা
৫. ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ, ছিন্নপত্র, বিশ্বভারতী, পুনর্মুদ্রণ, ১৪১১ কলকাতা
৬. দেবী মৈত্রেয়ী, মংপুতে রবীন্দ্রনাথ, প্রজ্ঞা প্রকাশনী, পরিবর্ধিত ২য় মুদ্রণ, ১৩৬৫, কলকাতা।
৭. ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্র রচনাবলী, ১ম - ১৫ খণ্ড, বিশ্বভারতী, বিশ্বভারতী সংস্করণ, ১৪০২ কলকাতা
৮. মুখোপাধ্যায় প্রভাতকুমার, রবীন্দ্রজীবনী ও রবীন্দ্রসাহিত্য - প্রবেশক, ১ম, ৪র্থ খণ্ড, বিশ্বভারতী সংস্করণ, ১৯৭০, কলকাতা
৯. সেনগুপ্ত নন্দগোপাল, রবীন্দ্র সংস্কৃতি, পুস্তক বিপনী, ১ম প্রকাশ, ১৩৯৪, কলকাতা
১০. সেনগুপ্ত ড. সত্যপ্রসাদ, রবীন্দ্রনাথের গল্প, মুক্তধারা, ৪র্থ প্রকাশ, ১৯৯০, ঢাকা
১১. পোদ্দার অরবিন্দ, রবীন্দ্রনাথ / রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব, প্রত্যয় প্রকাশনী, ১ম প্রকাশ, ১৯৮২, কলকাতা
১২. মুখোপাধ্যায় শ্রীবিশু (সম্পাদিত), রবীন্দ্র- সাগর সংগমে, এন সি সরকার এন্ড সন্স প্রা. লি., ১ম প্রকাশ, ১৩৬৯, কলকাতা
১৩. আলী মোবাশ্বের, রবীন্দ্রনাথ : অন্তরঙ্গ আলোকে, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ১ম প্রকাশ, ২০০০, ঢাকা
১৪. মজুমদার পম্পা, রবীন্দ্র সংস্কৃতির ভারতীয় রূপ ও উৎস, দে'জ পাবলিশিং, ১ম দে'জ সংস্করন, ২০০৭, কলকাতা
১৫. চট্টোপাধ্যায় ড. সুপর্ণা, রবীন্দ্র-নাট্য আলোচনায় রবীন্দ্রনাথ, করুণা পাবলিশার্স, ১ম প্রকাশ, ২০০২, কলকাতা
১৬. সমাদ্দার শেখর, রবীন্দ্রনাথ ও আধুনিক নাট্য, প্রতিক্ষণ পাবলিকেশন, ১ম প্রকাশ, ১৯৯৮, কলকাতা
১৭. সেন অশোক, রবীন্দ্রনাট্য পরিক্রমা, ১ম খণ্ড, এ. মুখার্জী এন্ড কোং প্রা. লি., ১ম প্রকাশ, ১৩৬৪, কলকাতা
১৮. রবীন্দ্রনাথের গীতিনাট্য ও নৃত্যনাট্য, প্রণয়কুমার কুণ্ডু, ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানী, ২য় প্রকাশ, ১৯৮৪, কলকাতা
১৯. ভট্টাচার্য শ্রীআশুতোষ, বাংলা নাট্য সাহিত্যের ইতিহাস, এ. মুখার্জী এন্ড কোং প্রা. লি.,৩য় সংস্করণ, ১৯৬১, কলকাতা
২০. ভট্টাচার্য উপেন্দ্রনাথ, রবীন্দ্র- নাট্য পরিক্রমা, ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানী, ৫ম সংস্করণ, ১৪০৫, কলকাতা
২১. মার্কস কার্ল ও এঙ্গেলস ফ্রেডরিখ, কমিউনিস্ট পার্টির ইস্তেহার, Marxist Internet Archive.

Citation: মাইতি দাস. অ., (2025) "রবীন্দ্র নাটকে শ্রমজীবী মানুষ ও তাদের আন্দোলন", *Bharati International Journal of Multidisciplinary Research & Development (BIJMRD)*, Vol-3, Issue-02, February-2025.